

সন্ত্রাসবাদের অর্থ

‘সন্ত্রাসবাদ’ শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে ‘সন্ত্রাস’ শব্দটি থেকে যার অর্থ হচ্ছে ভয়ভীতি এবং আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তি ও উন্নয়ন বা উৎপাদনের পথে বাধা প্রদান করা। অপর দিকে ‘সন্ত্রাসবাদ’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে নাশকতা মূলক কর্মকান্ড। আধুনিক বিশ্বে বসবাস করে কেহ সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কথা অস্বীকার করতে পারে না। সত্যিকার অর্থে ‘সন্ত্রাসবাদ’ হচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু দুষ্টি বা অসং চরিত্রের লোকদের দ্বারা সংঘটিত কিছু সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। এক কথায় আমরা বলতে পারি সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকেই ‘সন্ত্রাসবাদ’ বলা হয়। ‘সন্ত্রাসবাদ’ বিভিন্ন উপায়ে সংঘটিত হতে পারে যার মধ্যে বোমা হামলা, বোমাতংক, অপহরণ, হত্যা, হুমকি প্রদান এবং অস্ত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ভয়ভীতি সৃষ্টি উলেখযোগ্য। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ‘সন্ত্রাসবাদ’ বলতে বুঝায় যে কোন ধরনের ধবংসাত্মক মনোভাব যা প্রতিষ্ঠানের অর্থ সম্পদ ক্ষতি সাধন সহ উৎপাদন বা রপ্তানীর পথে বাধা প্রদান এবং যার ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্যদিকে তেমনি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন।

‘সন্ত্রাসবাদ’ হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তির বিপর্যয় এবং বর্তমান অধুনিক বিশ্বের সর্বত্রই সামাজিক বিশৃংখলার প্রতিষ্ঠা। এর প্রভাব সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক এবং জাতীয়ক্ষেত্রে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। অধুনিক সভ্যতার অগ্রযাত্রা সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের দ্বারা বাধাগ্রস্ত। অপশক্তি সর্বত্রই তাদের প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ‘সন্ত্রাসবাদ’ এর সমপ্রসারণ ঘটতে চায়।

‘সন্ত্রাসবাদ’ এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা বানিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান, দারিদ্র বিমোচন সবকিছুর উন্নয়ন থমকে দাঁড়ায়। সর্বত্রই থাকে বিশৃংখলা ও উৎকণ্ঠার ছাপ। মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে না এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে কোন সময় ধ্বস নেমে আসতে পারে। ইহা সামাজিক জীবন বিপন্ন শিল্প উন্নয়নে বাধা সহ রপ্তানী যোগ্য তৈরী পোশাক শিল্পের এবং উৎপন্ন দ্রব্যের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে পারে। এর ফলে বিদেশী ক্রেতার হা হা বিমুখ। তৈরী পোশাকের সাথে সম্পৃক্ত ২০ লাখেরও অধিক শ্রমিক তাদের চাকুরী হারাতে পারে। ‘সন্ত্রাসবাদ’ এর বিস্তৃতি ঘটলে জাতি এক মূহুর্তের জন্যও স্থির থাকতে পারে না। অতএব শুধু নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীরাই নয় বরং সকলের উচিত এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। নিরাপত্তা কর্মীদের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সন্ত্রাসবাদ কী:

সন্ত্রাসবাদ ক জনসংখ্যার মধ্যে সন্ত্রাস জাগিয়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট উগ্রপন্থী সংস্থাগুলি দ্বারা ব্যবহার করা সহিংসতার রূপ, সাধারণত রাজনৈতিক, আদর্শিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে।

সন্ত্রাসবাদ বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় **শারিরিক নির্যাতন** (অপহরণ, খুন, আক্রমণ, নির্যাতন, ইত্যাদি) বা এর **নৈতিক সহিংসতা** (পণ্য, বিস্ফোরক, আগুনের ধ্বংস), নাগরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বা নির্দিষ্ট

সামরিক লক্ষ্যগুলির বিরুদ্ধে বারবার এবং নির্বিচারে পরিচালিত হয়েছিল এবং সামাজিক বিপদ ও প্রভাব সৃষ্টির জন্য সরকার বা সমাজকে সন্ত্রাসীদের টার্গেটের স্বার্থে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে বা না করার জন্য বাধ্য করে।

সন্ত্রাসবাদ জাতীয় বা বৈশ্বিক পর্যায়ে এমন অনেক সংস্থা ব্যবহার করে যা নির্দিষ্ট আদর্শের প্রতিরক্ষায় নিজেকে রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করে। এই অর্থে, তারা ডান বা বাম, রাজনৈতিক বা ধর্মীয়, colonপনিবেশবাদী বা স্বাধীন, বিপ্লবী বা রক্ষণশীলদের সংগঠন হতে পারে।

তেমনি, সন্ত্রাসবাদের ধারণার একটি দৃ political় রাজনৈতিক অভিযোগ রয়েছে যা থেকে বোঝা যায় যে, এটি সরকার বা রাজনৈতিক সংগঠনের মুখপাত্ররা তাদের বিরোধীদের দোষারোপ করার জন্য এবং তাদের সংগ্রামকে প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যবহার করে। একইভাবে, এটি ঘটে যায় যাঁরা এতটা যোগ্য, তারা এটিকে প্রত্য্যখ্যান করেন, যেহেতু তারা মনে করেন যে তাদের লড়াইটি বৈধ।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

যখন জাতীয় সীমা অতিক্রম করে এমন স্তরে সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে কয়েকটি সাংগঠনিক কাঠামোযুক্ত দলগুলি আন্তর্জাতিকভাবে অনুশীলন করে, তখন বলা হয় যে আমরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে মোকাবেলা করছি। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য এবং মাত্রা সম্পর্কে কিছু অদ্ভুততা রয়েছে। এই অর্থে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংস্থাগুলি দ্বারা সংঘটিত হিংসাত্মক কাজ, অপহরণ বা আক্রমণগুলির রূপ নেয় attacks তাদের সাধারণত কিছু আদর্শিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় লক্ষ্যে অভিন্ন থাকে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের উদাহরণ হ'ল হামলার আক্রমণ **11 ই সেপ্টেম্বর, 2001 নিউ ইয়র্কে**, যারা **মার্চ 11, 2004 মাদ্রিদে**, বা তাদের **নভেম্বর 13, 2015 প্যারিসে**।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কি অবসান ঘটতে চলেছে? অন্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল-কায়েদার অবস্থাই বা কী? আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্যে এর নিকট ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা জরুরি। এই নিবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা।

১. আইএস কীভাবে রাষ্ট্র ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও বিশ্বরাজনীতির দিকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখেন, জুন মাসের শেষ দিকে তাঁদের মনোযোগ প্রধানত ছিল কথিত ইসলামিক স্টেটের (আইএস) কার্যকলাপের ওপর। ইরাকের মসুল শহরে ইরাকের সরকারি বাহিনীর সঙ্গে আইএস জঙ্গিদের শেষ লড়াই, সিরিয়ার রাকায় যুদ্ধে আইএসের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশা, আবু বকর আল বাগদাদি রাশিয়ার হামলায় নিহত হয়েছেন কি না সেই বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ; ফিলিপাইনের মিন্দানাওয়ের মারাউই শহরে আইএসের সশস্ত্র সমর্থকদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের সেনাবাহিনীর অভিযান ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। এর বাইরে উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাও ছিল, যেমন লন্ডনে গাড়ি নিয়ে হামলা, আফগানিস্তানের কাবুলে ব্যাংকে বোমা হামলা ও পাকিস্তানের পারাচিনার বাজারে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন যথাক্রমে ৩৫ এবং ৭০ জনের বেশি। আইএসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় যেসব অভিযান চলছিল, সেগুলোই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কেননা, দৃশ্যত এই সব লড়াই থেকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিশেষত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিদার হিসেবে, আইএসের ভবিষ্যৎ বোঝা যাবে বলেই

ধারণা করা হচ্ছিল। ইরাক ও সিরিয়ায় আইএসের পরাজয় যে অভ্যাসন, সে বিষয়ে গত কয়েক মাসের ঘটনাপ্রবাহ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করলেও এই ধারণা আরও সুদৃঢ় হয় এই সময়েই।

কিন্তু সেই সময়ে অর্থাৎ জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, আল-কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট (একিউআইএস, ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদা) একটি দলিল প্রকাশ করেছে, যা সবার মনোযোগ দাবি করে। কুড়ি পৃষ্ঠার এই দলিলের শিরোনাম হচ্ছে 'কোড অব কন্ডাক্ট ফর মুজাহিদীন ইন দ্য সাব-কন্টিনেন্ট' বা 'উপমহাদেশের মুজাহিদদের আচরণবিধি'। এই দলিলের তাৎপর্য রয়েছে সারা বিশ্বের সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আল-কায়েদার নতুন কৌশলের ইঙ্গিতের বিবেচনায়। বাংলাদেশে যাঁরা জঙ্গিবাদবিষয়ক গবেষণা এবং কাউন্টার টেররিজমের সঙ্গে যুক্ত, এ বিষয় তাঁদের মনোযোগ দাবি করে। তবে এই দলিলের বিষয়বস্তু এবং এই দলিল কিসের ইঙ্গিত দেয়, সে সম্পর্কে আলোচনার আগে সারা পৃথিবীতে সাংগঠনিকভাবে আল-কায়েদার অবস্থা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তার শক্তি ও কৌশলের বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত ধারণা থাকা দরকার।

আইএস ও আল-কায়েদার বাইরে অবশ্যই আরও সন্ত্রাসী সংগঠন আছে, যেমন সোমালিয়ায় আল শাবাব, নাইজেরিয়ার বোকো হারাম, ফিলিপাইনের আবু সায়্যফ, পাকিস্তানের হরকাতুল মুজাহিদীন, যারা ইসলামপন্থী উগ্রবাদে বিশ্বাসী; ২০১০ সালের পর এদের কোনো কোনো সংগঠন, যথাক্রমে আল-কায়েদা বা আইএসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয় রাষ্ট্রবহির্ভূত বা নন-স্টেট সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে এখন পর্যন্ত প্রধান সংগঠন হচ্ছে আইএস ও আল-কায়েদা।

গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আল-কায়েদা খুব বেশি আলোচিত হয়নি, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আইএসের উত্থান, ইরাক ও সিরিয়ার এক বড় অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন, তাদের অভূতপূর্ব নৃশংসতা, বিশ্বের অন্যত্র তার উপস্থিতি ও হামলা এবং সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে আইএসের কারণে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতাসহ বিভিন্ন ধরনের মেরুকরণ। ২০১৩ সালে আইএসের সঙ্গে আল-কায়েদার সম্পর্কচ্ছেদও এর একটি কারণ। গত কয়েক বছরে আল-কায়েদার প্রতি দৃষ্টি না থাকার অর্থ কি এই যে আল-কায়েদার মৃত্যু ঘটেছে বা আল-কায়েদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে?

২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অভিযান এবং ক্ষমতা থেকে তালেবানের অপসারণের পর আল-কায়েদা সেন্ট্রাল বা আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় কমান্ড ও প্রধান নেতারা হয় মারা যায় অথবা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আল-কায়েদার বিরুদ্ধে অব্যাহত সামরিক অভিযানের প্রেক্ষাপটে সংগঠনের দুর্বলতা প্রকাশিত হলেও সাংগঠনিকভাবে আল-কায়েদা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়নি। বরং সংগঠনটি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে তাদের কার্যক্রম বিস্তারের কৌশল গ্রহণ করে। ২০১৪ সাল নাগাদ আমরা আল-কায়েদার অন্তত তিনটি শক্তিশালী আঞ্চলিক শাখার উপস্থিতি ও সক্রিয়তা চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে আল-কায়েদা ইন মাগরেব, আল-কায়েদা ইন আরব পেনিনসুলা এবং আল-কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট। এর বাইরে আছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আল-কায়েদার সাংগঠনিক উপস্থিতি। এসব আঞ্চলিক সাংগঠনিক কাঠামোর উপস্থিতির অর্থ এই নয় যে বিভিন্ন দেশে আলাদা করে আল-কায়েদার দেশীয় শাখা নেই। অনেকের ধারণা যে এই দেশভিত্তিক শাখাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা বিশ্লেষক বারাক মেন্ডেলসন বলেন যে আল-কায়েদা এখন পর্যন্ত সাতটি শক্তিশালী শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলো হচ্ছে সৌদি আরব (২০০৩), ইরাক (২০০৪), আলজেরিয়া (২০০৬), ইয়েমেন (২০০৯), সোমালিয়া (২০১০), সিরিয়া (২০১২) এবং ভারতীয় উপমহাদেশ (২০১৪) (দেখুন,

দ্য আল-কায়েদা ফ্র্যাঞ্চাইজ: দ্য এক্সপানশন অব আল-কায়েদা অ্যান্ড ইটস কনসিকিউয়েন্সেস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৬)।

আল-কায়েদা পুনর্গঠনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ এবং পরবর্তী নৈরাজ্যকর রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ইরাক আক্রমণ আল-কায়েদাকে নতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। একদিকে ডি-বাথফিকেশনের নামে সুসংগঠিত সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে হাজার হাজার প্রশিক্ষিত সেনাসদস্য ও অফিসারের চাকরিচ্যুতি, অন্যদিকে দখলদার বাহিনী কর্তৃক একেবারে মৌলিক সেবাব্যবস্থা, যেমন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা, সাধারণ নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে পড়া একধরনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। প্রাথমিকভাবে সাদাম হোসেনের সমর্থকেরা যে প্রতিরোধ তৈরি করেছিল, তা সামরিকভাবে মোকাবিলা করার সময় মার্কিন বাহিনীর আচরণ, বিশেষ করে আবু গারাইবের মতো বিভিন্ন কারাগারে অত্যাচারের ঘটনা, ইরাকিদের এই বিদ্রোহীদের প্রতিই সহানুভূতিশীল করে তোলে।

এই পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে ২০০৫ সালে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার পর। প্রথমত ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সুন্নি জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ না করা এবং ডিসেম্বরের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত নূর-ই-আল মালিকি সরকারের নীতিসমূহ, যা সংখ্যালঘু সুন্নিদের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের পথ সীমিত করে দেয়। মুক্তাদা আল-সদরের নেতৃত্বাধীন উগ্রপন্থী সদর বাহিনীর উত্থান, তার ব্যাপক প্রভাব এবং একটি অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরিতে সরকারের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক অনুল্লয়ন এমন অবস্থা তৈরি করে, যে কারণে আল-কায়েদার পক্ষে সেখানে শক্তি সঞ্চয় সম্ভব হয়।

আবু মুসািব আল জারকাবি ১৯৯৯ সাল থেকে 'জামাত আল তাওহিদ ওয়াল জিহাদ' নামে যে সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন, তা-ই ২০০৪ সালের অক্টোবরে আল-কায়েদায় যোগ দেয় এবং আল-কায়েদা ইন ইরাক (একিউআই) হিসেবে প্রকাশিত হয়। ইরাকে মার্কিনদের বিরুদ্ধে সাদাম সমর্থক প্রতিরোধ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর সখ্য থাকলেও জারকাবির লক্ষ্য হয়ে ওঠে শিয়া-সুন্নি বিভেদকে সহিংস সংঘাতে পরিণত করা। তাতে তিনি সাফল্যও লাভ করেন। কিন্তু এই কৌশল নিয়ে আল-কায়েদার নেতাদের সঙ্গে, বিশেষ করে আয়মান আল জাওয়াহিরির সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূচনা হয়। ২০০৬ সালের গোড়ায় জারকাবি অন্য কিছু জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে একত্রে গড়ে তোলেন 'মুজাহিদিন শুরা কাউন্সিল', উদ্দেশ্য তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। জুন মাসে জারকাবি এবং তাঁর দীক্ষাগুরু শেখ আবদেল রহমান মার্কিনদের হামলায় মারা গেলে এর নেতৃত্বে আসেন আবু আইয়ুব আল মাসরি, ১৫ অক্টোবর 'ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক' বলে নতুন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং আমির-উল-মোমিনিন হিসেবে ঘোষণা করা হয় আবু উমর আল বাগদাদির নাম (আসল নাম হামিদ দাউদ খালিল আল-জাউই, মৃত্যু ২০১০)। আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতারা, এমনকি ওসামা বিন লাদেন, এই রাষ্ট্র এবং কথিত আমির-উল-মোমিনিনের প্রতি সমর্থন জানান।

২০১০ সালে কথিত 'ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক'-এর প্রধান বা আমির-উল-মোমিনিনের দায়িত্ব নেন আবু বাকার আল বাগদাদি (আসল নাম ইবরাহিম ইবনে আওয়াদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাদরি); ২০১৩ সালের ৯ এপ্রিল ইসলামিক স্টেটকে সিরিয়ায় সম্প্রসারিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। সিরিয়ায় এর অংশ বলে বিবেচিত হয় ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাবাত আল নুসরা'। সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের সম্প্রসারণের ঘোষণা নিয়ে আল-কায়েদাপ্রধান জাওয়াহিরির সঙ্গে আবু বকর বাগদাদির প্রকাশ্য বিরোধের প্রেক্ষাপটে ২০১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আল-কায়েদা ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়। স্মরণ করা দরকার যে ইতিমধ্যে

দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হয়েছেন আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেন—২০১১ সালের ২ মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন বাহিনী অভিযান চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে। তার তিন বছরের মাথায়, ২০১৪ সালের মে-জুন মাসে ইরাকের মসুলসহ বেশ কিছু এলাকা এবং সিরিয়ার একটি অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপনের পর ২৯ জুন 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া, দিনটি ছিল ১৪৩৫ হিজরি সনের রমজান মাসের প্রথম দিন। খলিফা হিসেবে ঘোষিত আবু বকর আল বাগদাদি ৪ জুলাই শুক্রবার মসুলের গ্র্যান্ড মসজিদে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেন।

২. আইএসএর সমান্তরালে আল-কায়েদার শক্তি সঞ্চয় আবু বকর আল বাগদাদির নেতৃত্বে ২০১৪ সালের জুন মাসে ইসলামিক স্টেটের আবির্ভাবের পর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আলোচনায় আইএসএর প্রাধান্য থাকলেও আরেক সন্ত্রাসী সংগঠন, ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আল-কায়েদা তখনো সক্রিয় এবং খানিকটা অগোচরেই শক্তি সঞ্চয় করছে। ইতিমধ্যে আল-কায়েদা ২০১০-১১ সালের 'আরব বসন্ত'-এর ধাক্কা সামলে উঠেছে, পাকিস্তান ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তাদের বিরুদ্ধে চালানো অব্যাহত ড্রোন হামলা মোকাবিলা করেছে; শীর্ষস্থানীয় নেতা ওসামা বিন লাদেন, আনোয়ার আল আওলাকিসহ একাধিক নেতার মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। আয়মান আল জাওয়াহিরির নেতৃত্বে আল-কায়েদার আঞ্চলিক শাখা আল-কায়েদা ইন মাগারেব (একিউআইএম) এবং আল-কায়েদা ইন আরব পেনিনসুলা (একিউএপি)—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে আল-কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট (একিউআইএস)। ফলে একদিকে আল-কায়েদার ঘটেছে শক্তিক্ষয়, অন্যদিকে নতুন কার্ঠামো নিয়ে আল-কায়েদা সংগঠিত হয়েছে।

একিউআইএম প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৭ সালে, আলজেরিয়ার সন্ত্রাসী সংগঠন জিএসপিসি আল-কায়েদার সঙ্গে একীভূত হওয়ার পর। তবে একিউআইএম প্রধানত মালিকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মালি, বুরকিনা ফাসো, মৌরিতানিয়া, মরক্কো ও তিউনিসিয়ায় তাদের সহযোগী ও শাখা সংগঠনগুলোর কাজের সমন্বয় এই আঞ্চলিক কার্ঠামোর উদ্দেশ্য; যেখানে এ ধরনের সাংগঠনিক উপস্থিতি নেই, সেখানে এ ধরনের সংগঠন তৈরি করাও ছিল তাদের প্রচেষ্টার অন্তর্গত। ২০১১ সালে তিউনিসিয়া ও লিবিয়ায় আনসার আল-শারিয়া, ২০১২ সালে তিউনিসিয়ায় কাতিবাত আকবা ইবনে নাবির প্রতিষ্ঠা থেকেই তা প্রতিভাত হয়। এর বাইরে ওই সব দেশে যেসব জঙ্গি সংগঠন আছে, তাদের সঙ্গে আল-কায়েদা সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে, যেমন সোমালিয়ায় আল শাবাব, নাইজেরিয়ায় বোকো হারাম।

একিউআইএমের বিস্তৃতি, শক্তি সঞ্চয় ও ভয়াবহতা বোঝার জন্য ২০১২-১৩ সালে মালির উত্তরাংশে এক বড় এলাকাজুড়ে তাদের দখল প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণই যথেষ্ট। ফ্রান্সের সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়েই এই এলাকায় মালি সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু এরপর একিউআইএম ফ্রান্সে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে এবং কয়েকটি হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে। এই গোষ্ঠীর আক্রমণের আরও উদাহরণ রয়েছে আলজেরিয়া থেকে বুরকিনা ফাসো পর্যন্ত। লিবিয়ায় গাদ্দাফি সরকারের পতনের পর সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগে লিবিয়ার কালোবাজার থেকে একিউআইএমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জঙ্গিরা অস্ত্র সংগ্রহ করেছে বলেই জানা যায়। তাদের অর্থের এক প্রধান উৎস হচ্ছে পশ্চিমাদের পণবন্দী হিসেবে নেওয়া। এ বছরের জুন মাসের শেষ দিকে এ রকম একজন পণবন্দী সুইডেনের নাগরিক ছয় বছর আটক থাকার পর মুক্তি লাভ করেছেন।

২০০৯ সালে এসে উদ্ভব ঘটে আল-কায়েদা ইন আরব পেনিনসুলার (একিউএপি); এই আঞ্চলিক কার্ঠামোর প্রধান এলাকা হচ্ছে ইয়েমেন ও সৌদি আরব। ইয়েমেনে ১৯৯০-এর দশক থেকেই আফগান যুদ্ধেরত যোদ্ধারা

সংগঠিত ছিল বিভিন্ন নামে, যেমন ইসলামিক জেহাদ ইন ইয়েমেন (১৯৯০-৯৪), আর্মি অব এডেন আবয়িয়ান (১৯৯৪-৯৮) এবং আল-কায়েদা ইন ইয়েমেন (১৯৯৮-২০০৩)। এরাই ২০০০ সালের অক্টোবরে এডেন বন্দরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস কোলে বোমা হামলা চালিয়েছিল। ইয়েমেনে জঙ্গিদের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল আলী আবদুল্লাহ সালেহ সরকারের প্রত্যক্ষ মদদেই, দক্ষিণের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবিলা করার কৌশল হিসেবে সালেহ আশির দশকে আফগানিস্তানে ইয়েমেনিদের পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের পরে দক্ষিণে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। সেই জঙ্গিরাই পরে আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত হয়; ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা হয় আনসার আল শারিয়া। এরাই ২০১১ সালে আবয়ান প্রদেশের একটি এলাকা দখল করে নিয়ে সেখানে তাদের শাসনব্যবস্থা চালু রাখে প্রায় এক বছর। সালেহ সরকারের পতনের পর (২০১২) তার উত্তরসূরির বিরুদ্ধে শিয়া মতানুসারী হুতি জনগোষ্ঠী যে বিদ্রোহ চালাচ্ছে, তার বিপরীতে আল-কায়েদা সুন্নি মতাবলম্বীদের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হয়ে গৃহযুদ্ধে শরিক হয়েছে এবং ক্রমাগতভাবে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। নতুন সরকারের প্রতি সমর্থনের নামে এই সংকটে সৌদি আরবের সংযুক্তি এবং রাজনৈতিক সমাধানের বদলে নির্বিচার হামলা ও যুদ্ধ এই পরিস্থিতির আরও অবনতিই ঘটিয়েছে। আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের ফেলো ক্যাথরিন জিয়ারম্যান গত ১৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের একটি সাব-কমিটির শুনানিতে 'আল-কায়েদা ইজ স্ট্রেন্গেনিং ইন দ্য শ্যাডোজ' শিরোনামে দেওয়া বক্তব্যে বলেন যে ইয়েমেন আল-কায়েদার বৈশ্বিক অপারেশন এবং জ্যেষ্ঠ নেতাদের একটি 'নিরাপদ স্বর্গে' পরিণত হয়েছে।

একিউএপির দ্বিতীয় প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে সৌদি আরব। আল-কায়েদার সঙ্গে সৌদি যোগাযোগের একটি দিক হচ্ছে আদর্শিক, অন্যটি ঐতিহাসিক। ওসামা বিন লাদেন সৌদি নাগরিক ছিলেন এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সৌদি ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধই ছিল না। তদুপরি ৯/১১-এর ১৯ জন হামলাকারীর ১৫ জন ছিল সৌদি নাগরিক এবং এই হামলার পরিকল্পনাকারীদের বড় অংশই এসেছিল সৌদি আরব থেকে। এই অভিযোগও আছে যে সৌদি আরবের ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালীরা জ্ঞাতসারেই আল-কায়েদার এই অভিযানে অর্থের সংস্থান করেছিল। এসব তথ্যের পাশাপাশি এটাও আমরা জানি যে ২০০৩ সাল থেকে সৌদি আরবের ভেতরেই আল-কায়েদার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আল-কায়েদার জঙ্গিরা বেশ কিছু হামলা চালাতে সক্ষম হয়েছে।

ক্যাথরিন জিয়ারম্যানের মতে, সাম্প্রতিক কালে আল-কায়েদার শক্তি সঞ্চয়ে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে এবং এখনো রেখে চলেছে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ। জাওয়াহিরি যে ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, সেটা তাঁর একাধিক বক্তব্যেই স্পষ্ট।

এসব সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক শাখার বাইরেও আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠন আছে এবং তার অনেকগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী বলেই বিবেচিত। আল-কায়েদার একটা বড় উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, যেখানে আঞ্চলিক শাখা না থাকলেও সাংগঠনিকভাবে যুক্ত সংগঠন ছিল বা রয়েছে; যেমন ইন্দোনেশিয়ার লঙ্কর-এ-জুনাদুল্লাহা, জামিয়া ইসলামিয়া, মালয়েশিয়ায় কুম্পুলান মুজাহিদিন, থাইল্যান্ডের জামিয়া সালাফিয়া। আবু সায়েফ এবং মরো ইসলামিক ফ্রন্ট ইসলামিক স্টেটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আগ পর্যন্ত আল-কায়েদার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। এ ধরনের যোগাযোগ ১৯৯০-এর গোড়া থেকেই উপস্থিত। যে কারণে ১৯৯৪ সালে রামজি ইউসুফ এবং ৯/১১-এর অন্যতম পরিকল্পনাকারী খালিদ শেখ মুহাম্মদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসেই ১২টি মার্কিন বিমান ছিনতাই করার পরিকল্পনা করেছিলেন; কুয়েতি জঙ্গি ওমর আল ফারুক দক্ষিণ এশীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য ক্যাম্প তৈরি করেছিলেন। এসব জঙ্গিই এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী হামলা চালায়, যার

